নাম ছিল তাঁর জন হেনরি

-কৃশানু মিত্র (Krishanu Mitra), জ্যেষ্ঠ পুত্র (Eldest Son): আদরের বাপি/ডাকু

বয়সের হিসাবে মায়ের পরে যে সবচেয়ে বেশি বাবার সাহচর্য পেয়েছে, সে আমি, বাবার বড় ছেলে কৃশানু মিত্র। জীবনের প্রতিটি সফলতা, বিফলতায় বাবা ছিল আমার সঙ্গে। তার সাহচর্য ,তার সাহস, সততা এবং ভুলগুলো নিয়ে আমার জীবনের বিন্যাস। যার ঠিক, বেঠিক মাপবে সময়,পরের প্রজন্ম।

ঘোষাল বাবুর বাড়িতে আমরা ভাড়া থাকতাম, জানলা খুললেই মুখার্জী পুকুর । আমার পাঁচ বয়স বছর বয়সে বাবা আমাকে নিয়ে সাঁতার শেখাতে নামিয়েছিল সেখানে। সেই প্রথম জলে নামা , আমি খুব ভয় পাচ্ছিলাম। বারবার ডাঙ্গার দিকে উঠে পালাবার চেষ্টা করছিলাম। বাবা বকাঝকা করলেও আমি তা মানতে চাইছিলাম না। বাবা রাগ দেখিয়ে আমাকে গভীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কোনরকমে হাত পা ছুঁড়ে আমি বাঁচার চেষ্টা করে ডাঙ্গার দিকে আসতে থাকি,অদ্ভুত ভাবে আমার ভয়টা ভেঙে যায়। জীবনে এই প্রথম মানুষটার কাছ থেকে সাহসী হওয়ার ব্যাকারন রপ্ত করি আমি। যা অনেক পথ পাড়িয়ে আমি বুঝেছিলাম। তারপর থেকে জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে ওর সাহসে আমি বলিয়ান হতাম। ওঁর ভয় না মানা উচ্চশির আমাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে সহযোগিতা করেছিল। এরপরে সত্তর দশকের আগুনের দিন এসে গেল সমাজের বুকে, যার পক্ষে বিপক্ষে হাজারো মানুষ জড়িয়ে পড়ে। ছোট্ট ডাকু সেই সময় বাবার আচরণে আবিষ্ট হয়ে এই সময়টাকে ভীষণভাবে মহাভারতের যুদ্ধে বিদুরের মতো দেখতে শুরু করেছিল যদিও তার কোনো দায় ছিলনা কাউকে শোনাবার। সেই সময়ে বহু সাধারণ মানুষ, সহযোদ্ধা, এবং বাবা মিলেমিশে অংশগ্রহণ করেছিল রাজনীতিতে।

অর্থনৈতিক কারণে আমাকে মায়ের সাহচর্যেই ছোট থেকে বড় হতে হয়েছিল। আমাদের বাড়ির প্রত্যেকটি সন্তান যেমন এখন বাবার দেওয়া বিশেষ নাম বহন করে, আমারও সেইরকম একটি বিশেষ নাম ছিল ডাকু। লেখাপড়ায় আমি কখনোই ভালো ছিলাম না তার কারণ আমার ওপর নজর করার কেউ ছিলনা। আমরা বেলুড়ের বাড়ি ছেড়ে লিলুয়া রেল কোয়ার্টারে যাই ১৯৭২ সালে। তিনতলায় আমাদের থাকার জায়গা । পাশের মাঠে আমি সারাটা দিন কাটাতাম গুলি ,ক্রিকেট-ফুটবল,লাল লাঠি ,কবাডি, পিট্টু আরো কত কিছু খেলে। কোন বাধা পায়নি বাবার থেকে কখনো। মাঝে মাঝে যখন সন্ধ্যা নেমে যেত সাতটা, সাড়ে সাতটা আমি ঘরে ঢুকছি না অন্ধকারেই আমাদের খেলা চলছে স্ট্রিটলাইটে। দূর থেকে ভেসে আসত বাবার চিৎকার ডাকু.... ডাকু। যেন প্রভুভক্ত কোন কুকুর ডাক পেয়েছে তার প্রভুর।ভয়ের চেয়ে বেশি টানতো সেই ডাক, নিতান্ত অনিচ্ছায় দিতাম এক ছুট। সেই

দিন গুলো মণিমুক্তা খচিত আমার জীবনপাত্রে ।

বাবাকে ভীষণ কাছে পেতাম যখন আমি অসুস্থ হতাম। একবার আমার পক্স হয়েছে, চিকেন পক্স, ভীষণ কষ্ট সারা শরীরজুড়ে গুটি গুটি বসন্তের দাগ। টস টস করছে শরীর, যন্ত্রনায় কাতর আমি অন্ধকার ঘরে একা গান গাইছি। 'যেতে যেতে একলা পথে নিভেছে মোর বাতি।' বুঝতে পারিনি রাত দুটো আড়াইটার সময় কেউ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আমার গান শুনছে। কোথাও গানের মাঝখানে কোনো ব্যাঘাত হতে দেননি তিনি। গান শেষ হলে উনি বলছেন 'এইতো আমি, এই লড়াইয়ে তোর পাশে আছিতো।' রবীন্দ্রসঙ্গীত আমার তার কাছ থেকেই পাওয়া। যদিও তিনি গান গাইতে পারতেন না, কিন্তু শ্রোতা হিসেবে তিনি অনন্য ছিলেন। আমি যখন ভীষণভাবে বিহারী, উত্তরপ্রদেশের বন্ধুদের সঙ্গে বড় হচ্ছি আমার হিন্দি কালচার জীবনের অঙ্গ হয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় তিনি একটি টেপ রেকর্ডার কিনে এনেছিলেন। সেন পন্ডিত কোম্পানির একটি ছোট্ট টেপ রেকর্ডার সঙ্গে এগারোটি দেবব্রত বিশ্বাসের ক্যাসেট। আমার সংস্কৃতি হাঁটল এক্কেবারে উলটো পথ, উল্টো মুখে। এইভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমি না পেয়েও তিনি ছিলেন আমার কাছে।

পরীক্ষায় খারাপ ফল করতে করতে আমার লেখাপড়ার ওপরই বিরক্তি ধরে গেছিল। ছোটবেলা থেকে ভাবতাম আমি খেলোয়াড় হব। যদিও দূরে দূরে থেকেও আমি বাবার কাছ থেকে অংকের বেসিকস শিখে ফেলেছিলাম। এ নিয়ে সুপ্ত গর্বও ছিল আমার তাই লেখাপড়া আমি পারব না এই বোধ আমাকে কখনো গ্রাস করেনি। শুধু রেজাল্ট কখনোই ভালো করতে পারিনি। বাবা আমার ভেঙে পড়া বুঝতেন ,আমি এই ভাঙাচোরা দিনগুলোতে চাইতাম ওর অদ্ভুত স্নেহের স্পর্শ। যা ঠিক কিরকম বলে বোঝানো যাবে না। ওনার কারণেই আমি ছোটবেলা থেকে প্রশ্ন করতে শিখেছিলাম । যা ভবিষ্যত জীবনে আর এক গুরুর কাছে ফিলসফি বলে জেনেছিলাম। তাই আমার আর লেখাপড়া হলো না । আমার সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মত কাউকে পেতাম না।মনে আছে আমি যখন এঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং শিখছি, আর্টসের ছাত্র বাবা আমায় সাহায্য করছে, প্রথম যখন ক্যালকুলাস শিখছি তখনও। এই বয়স থেকে আমি বাবার সাহচর্য পেতে থাকি। আমার জ্ঞান ভান্ডারের বিস্তার লাভ করল এই প্রশ্নের কারণেই। আমি ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করতাম যা ছিল আমার ভবিষ্যতের নাস্তিক্যবাদের মূলভিত্তি।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই যুক্তিপথ হাঁটা বাপিকে, বাবা পৃথিবীর সবার থেকে আলাদা, অন্য চোখে দেখতো। আমার চোখে বাবার অবস্থান ছিল নায়ক বা হিরোর মত। সেই চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে

দিয়ে বাবা একই ভাবে একই সম্মান আমাকে দিতেন। কখনো কোনো কারণেই মনোমালিন্য হলে উনি ভীষণ কষ্ট পেতেন, জীবনের শেষ ভাগে এসে সেরকম ঘটনা একবার ঘটেছিল।খুব অভিমানে ভেঙে পড়েছিলেন বাপির উপরে- বাপি আমায় ভুল বুঝল ! সেদিন আমি দেখেছিলাম বাবার চোখে জল। একমাত্র প্রাণের আবেগে আবৃত্তি করার সময় যা স্পষ্ট বোঝা যেত। রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রতি আগ্রহ ও ভালোবাসা আমার ওর কাছে পাওয়া। 'তোমারে যা দিয়েছিনু তা তোমারি দান', আমার ক্ষেত্রে ঘটেছিল এর উল্টো। আমাকে যা উনি দেননি আমি তাও ওনার কাছ থেকেই পেয়েছি জীবনে। জমিদার সন্তান মিত্রদের আমি দেখেছি খুব কাছ থেকে,আগের প্রজন্মের প্রতিটি মানুষের মধ্যেই উন্নাসিকতার অবশেষ রয়ে গেছিল,যা হৃত সামন্ততন্ত্রের ছায়া বলে আমার মনে হয়। সুনীল গাঙ্গুলী বলেছিলেন 'অবিরল রঙের ধারার মধ্যে সুবর্ণ কঙ্কনপরা ফরসা রমণীরা/তারা আমায় দেখে আমোদে হেসেছে।' এই আক্ষেপের ঠিক উল্টো ভাবনা সঙ্গী করে আমি হেঁটেছি জীবনপথ, সচেতন ভাবে। সামন্ততন্ত্রের কোনও অবশেষ নেই আমার মধ্যে। এ শিক্ষা হয়ত বাবার কাছ থেকেই অবচেতনে পাওয়া। হয়তো তাই বাবা আমাকে খুব র‍্যাশনাল ভাবতেন। বিভিন্ন বিষয়ে তর্ক চলত আমাদের। বাবা আধুনিকতার সবকিছু মেনে নিতে পারত না, আধুনিকতা মানেই পুঁজিবাদ, এ বিপর্যয় ডেকে আনবেই এই সত্যই তিনি লালন করে এসেছিলেন গভীর বিশ্বাসের সাথে। প্রথমে আমিও এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলাম কিন্তু আস্তে আস্তে নিজের ভুলগুলোকে সংশোধন করতে পেরেছিলাম পরিবেশেগত কারণে। যে গান কে হৃদয়ে নিয়ে আমার এই বিশ্বাস, সেই গান অশ্রুত ছিল বাবার কাছে। আমার স্থির বিশ্বাস – 'I wish to change again' শুনলে উনিও বদলে নিতে পারতেন নিজেকে। আমার এই একমাত্র বাসনা অধরা রয়ে গেল জীবনে ।

শ্রমজীবী বাবাকে আমি আবিষ্কার করতাম জীবনের পরতে পরতে। যদিও আমার জীবনে দক্ষ শ্রমিক আমির জন্ম ঘটেনি কখনো । আমি ছিলাম অদক্ষ লেবার। আমায় কেউ জল তুলতে বললে জল তুলে দেবো মাথায় মোট বইতে বললে বয়ে দেবো। কিন্তু একজন দক্ষ, স্কিল্ড শ্রমিক হিসেবে আমি চিরকালই বেমানান। আমার জীবনে আমি একেবারেই পারফেক্সানিস্ট ছিলাম না। বাবার জীবনের দুটি ভাগ ছিল: একটা শিল্প, কৃষ্টি; অপরটি শ্রম ও সৃষ্টি। বাবা সরাসরি দক্ষ শ্রমিক হিসেবে নির্মাণ করেছেন জীবনে বহু কিছু। আমি সেই অর্থে সৃষ্টি করতে পারিনি কিছুটি। এই হতাশা আমার সারাজীবনের। আমার ভাই যা সহজাত ভাবেই উত্তরাধিকার সুত্রে পেয়েছিল। কিন্তু শ্রম আমার জীবনের অঙ্গ হিসেবে আমি মানি , আমার বাবার থেকে শেখা এই অমূল্য নীতিজ্ঞান আমার পাথেও।

বাবার আবৃত্তি করা পছন্দের কবিতার দুটি লাইন লিখে শেষ

করি।

‘কেন রে তোর দুয়ার খানি পার হতে সংশয় জয় অজানার জয়।’

ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সব বন্ধন নিজের কথা রেখে চলে গেলেন –আমি পড়ব আর মরব।

তোমার

বাপি/ডাকু